এভারেস্ট রূপকথার প্রথম নায়ক

(প্রথম পর্ব) - অরুণকান্তি ঘোষ

"প্রিয়তমা রুথ, এইমাত্র আমার স্বপ্নের দৌড় শেষ হয়েছে। যেখানে আমার পৌঁছনোর কথা ছিল, সেখানেই এসেছি। বিশ্বাস করো, পৃথিবীটা যে এত সুন্দর জানা ছিল না। আজ এইখানে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য এক গান শুনতে পাচ্ছি, অসীম বিশ্বের সঙ্গীত। জানো, খুব ইচ্ছে করছে এই গান তোমাকে শোনাই। কী করে শোনাই? আমি তো জানি না, কবে এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছবে। না, মনখারাপ কোরো না, এবার ঘরে ফিরছি। তার আগে অবশ্য বহুদূর নামতে হবে আমাকে। ওই যে স্যান্ডি ছেলেটা, নিচে উত্তরপূবে গিরিশিরায় একটা ঝুঁটির গায়ে অপেক্ষা করছে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে, আমার জন্য। কিন্তু আকাশের এক কোণে অনেকটা কালো মেঘ জমেছে, ফেরার পথে আলো থাকবে তো? আচ্ছা, যদি ফিরতে না পারি...! কষ্ট পেয়ো না, রুথ। তুমি জেনো, এই একজীবনে আমার যা দেখার ছিল, দেখেছি। যা পাওয়ার ছিল, পেয়েছি। এ মুহূর্তে খুব মনে পড়ছে তোমার মুখ। মনে পড়ছে ক্ল্যারি, বেরি ও জনের প্রিয় মুখগুলো। তোমরা সবাই আমায় ঘিরে রয়েছো, প্রতি মুহূর্তে। যদি ঘরে ফিরতে নাও পারি, শান্তিনিদ্রায় ব্যাঘাত হবে না। এভারেস্ট আমাকে আশ্রয় দেবে।"

এটা একটি চিঠির অংশ। এভারেস্ট চূড়োয় বসে লিখেছিলেন আমাদের প্রথম নায়ক। এর কোনও কপি নেই, নথি-পত্রে উল্লেখ নেই। বাস্তবে এমন চিঠি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবু কবির কল্পনা এই, তিনি লিখেছিলেন নোটবইতে তাঁর প্রিয় ফাউন্টেন পেন দিয়ে, যে পেনের কালি শূন্যের অনেক নিচের তাপাঙ্কেও সচল ছিল! আমাদেরও বিশ্বাস তাঁকে এই চিঠি লিখতেই হতো। কারণ চূড়োয় দাঁড়িয়ে তিনি বুঝেছিলেন, ঘরে

ফেরা অনিশ্চিত। এটা ১৯২৪-এর কাহিনী, আমাদের নায়কের গল্প শুরু হয়েছে তার তিন বছর আগে।

১৯২২ এ ব্রিগেডিয়ার চার্লস ব্রুস-এর নেতৃত্বে প্রথম সিরিয়াস মহড়া চলে এভারেস্ট সামিটের উদ্দেশে। অফিসিয়ালি সেটাই ছিল প্রথম এভারেস্ট অভিযান। তার আগে ১৯২১-এ একটি অভিযান হয়, তার উদ্দেশ্য ছিল মূলত সামিটের রাস্তা খুঁজে দেখা, এলাকার ঠিকঠাক মানচিত্র তৈরি করা। ২১-এ এভারেস্টের বিশাল চৌহদ্দি জুড়ে যে দীর্ঘ শ্রমসাধ্য রাস্তা খোঁজার পালা চলেছিল তার মধ্যে ছিলেন চেশায়ারের এক তরুণ অ্যালপাইন ক্লাইম্বার। এই তরুণ ২২-এর অভিযানেও ছিলেন। তিনি হাওয়ার্ড সোমারভিল এবং এডওয়ার্ড নর্টনের সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রথম শিখর-যাত্রা করেন উত্তরের গিরিশিরা দিয়ে। তিনজন অক্সিজেনের অভাবে বেদম হয়েও ২৬,৯৮০ ফুটের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে যান, কিন্তু শেষদিকে বিগড়ে যাওয়া আকাশ ওঁদের ফিরে আসতে বাধ্য করে। এরপরে জর্জ ফিঞ্চ'র নেতৃত্বে দ্বিতীয় যাত্রা (সেকেন্ড সামিট পুশ) শুরু হয়, ওঁরা ২৭,৩০০ ফুট উচ্চতায় উঠে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন ফিরে আসেন। আলোচ্য যুবক দ্বিতীয় দলে ছিলেন না। ততদিনে ঋতু বদলে যাচ্ছে, বর্ষা নামছে। নেতা নির্দেশ দিয়েছে, পাকাপাকি তাঁবু গুটিয়ে দেশে ফিরতে হবে। কিন্তু যুবক নারাজ। দেখতে তিনি রাজপুত্তুর, কিন্তু মেজাজে একরোখা। তিনি বায়না ধরেন, বর্ষার মুখে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন। দলে তাঁর গুরুত্ব যথেষ্ট, নেতা না বলতে পারেন না।

আমাদের নায়ক থার্ড সামিট পুশে বেরিয়ে পড়লেন একদল শেরপাকে নিয়ে। নর্থকলের নিচের ঢালে তখন কোমর-সমান নতুন বরফ জমেছে। তার মধ্যে অমানুষিক লড়াই চলছে নায়ক ও শেরপাদের, যে করেই হোক নর্থ কলে পৌঁছতে হবে। সামনে দিনের অনেকখানি পড়ে আছে। ঠিক সেই সময় ওপরের কর্নিশ ভেঙে নেমে এলো দানবের মতো এক অ্যাভাল্যাঞ্চ। পলকপাতে মারা গেল সাতজন শেরপা। বাকরুদ্ধ নেতা যাত্রা বাতিল করলেন। অভিযানও শেষ হয়ে গেল। তারপর সমালোচনা বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল তাঁর বিরুদ্ধে, দেশে এবং বিদেশে। বিখ্যাত ডঃ লংস্টাফ কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন নায়ককে, 'থার্ড সামিট-পুশের সিদ্ধান্ত ছিল হটকারি। সে লম্বা এক গল্প। বিতর্কের ব্যাপক ঝাপটার মধ্যে আলোচ্য নায়ককে নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। একটা বড় প্রশ্ন ছিল, 'আপনি কেন এত এভারেস্ট যেতে চান? সামিটের জন্য কেন এত বাড়াবাড়ি?' তিনি ছোট্ট উত্তর দিয়েছিলেন, 'Because it's there!' - 'কারণ ওটা আছে, ওখানেই আছে।' তিন শব্দের একটি কথা – Because it's there! – পর্বতারোহণের বিশ্বে সবার প্রিয় মন্ত্র হয়ে রয়ে গেল আজও। তিনি বলেছিলেন একথা। তিনি আর কেউ নন, জর্জ হারবার্ট লে ম্যালরি। আরোহণের রূপকথায় প্রথম নায়ক। যে নায়ক ১৯২৪ এর অভিযানে উত্তরপূর্ব গিরিশিরা পথে এভারেস্ট শীর্ষে পা রেখেছিলেন! হ্যাঁ, ম্যালরি এবং হয়তো সঙ্গী অ্যান্ড্রিউ আরভিন-ও ১৯২৪-এর ৮/৯ জুন পৃথিবীর উচ্চতম বিন্দুতে পা রেখেছিলেন প্রথম! কী বললেন? ইতিহাস তা বলছে না? হ্যাঁ, ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল ২৯ মে ১৯৫৩-য়, হিলারি ও তেনজিংয়ের পায়ের রেখা ধরে। তা ঠিক। দলিল দস্তাবেজ বা প্রামাণ্য ছবি সেকথাই বলে। কিন্তু যে সত্য আজও অনাবিস্কৃত, যে সত্য ভেসে বেড়ায় জনশ্রুতিতে, যে সত্য লেখা আছে লোকমনে, রূপকথায়, যে সত্য অনুসন্ধানী অভিযাত্রীদের হাতে ধরা দেবে বলে অপেক্ষা করে আছে প্রায় এক শতাব্দীকাল – সেই সত্য মতে, ম্যালরি এভারেস্ট শিরে পা রাখলেন, সর্বোচ্চ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে পৃথিবীটাকে দেখলেন, মনে করলেন সমতলের প্রিয় মুখগুলিকে, প্রিয়তমা স্ত্রী-কে, সহযাত্রী বন্ধুদের। আর একবার চারপাশে তাকিয়ে খুঁজে দেখলেন, ঈশ্বর কি তাঁকে দেখছে? না, কেউই দেখছে না। তিনি জানু পেতে বসলেন, দূর উর্ধলোকে তাকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে আকাশ ছুঁয়ে লক্ষে অলক্ষে থাকা সবার কাছে অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা জানালেন। এবার তিন বর্গমিটার

তুষারে মোড়া চূড়োর টেবিলের একধারে তিনি হাতের স্নো-স্টিক পুঁতে উড়িয়ে দিলেন পতাকা। ক্যামেরায় ধরে রাখেন যাবতীয় নিসর্গচিত্র, পৃথিবীটা যে এত সুন্দর জানা ছিল না। ছবিগুলো অবশ্য খুব জরুরি, কারণ ছবিই প্রমাণ করবে যে, তিনি পা রেখেছেন এভারেস্ট শিখরে। তারপর? পকেটে রাখা স্ত্রী'র ছবিটি পতাকার নীচে আসন পেতে বসালেন। প্রিয়তমা রুথ মনে মনে তাঁর অভিযান-সঙ্গী, এখানে একফালি জমিতে তাঁর জন্য একটা আসন তো পাওনা আছেই। নিজেও বসলেন পাশে। দীর্ঘ দুর্গমের যাত্রায় তিনি ভগ্নজানু, মনে সীমাহীন রোমাঞ্চ। পকেট থেকে নোটবই বের করে লিখতে থাকেন, প্রিয়তমা রুথ ...।

রূপকথার গল্প ছেড়ে দেখা যাক, নথিপত্র কী বলছে। ১৯২১-এর এক্সপ্লোরেশন দলে পিভোট ভূমিকা নিয়েছিলেন ম্যালরি, গাই বুলক এবং ই ও হুইলার। ওঁরা এভারেস্টের গায়ে বেশ কয়েকটা ছোট ও মাঝারি চূড়ায় উঠে গোটা এলাকা নজর করে দেখেন। ম্যালরি প্রথম দক্ষিণে লোথ্‌সে পর্বতের ভূমিদেশে ওয়েস্টার্ন ক্যুম দেখতে পান, এবং উত্তরে তিব্বতের দিকে রংবুক করিডর দিয়ে ঢুকে ইস্ট রংবুক গ্লেসিয়ার আবিস্কার করে পরিষ্কার বুঝতে পারেন, এটিই হচ্ছে এভারেস্ট সামিটের হাইওয়ে। ম্যালরি ওই হাইওয়ে ধরে চ্যাংশে ও এভারেস্টের মাঝখানের স্যাড্‌লে (নর্থ কল ২৩,০৩০ ফুট) পৌঁছে যান, সেখানে থেকে এভারেস্ট শীর্ষে (সামিট) পৌঁছনোর সম্ভাব্য একাধিক রাস্তা চিহ্নিত করেন। রাস্তাগুলি ছিল নর্থ বা নর্থ-ইস্ট রিজ (গিরিশিরা), উত্তরমুখের রক-ওয়ালের ওপরে লম্বা গালিপথ (পরবর্তীকালে বিখ্যাত গ্রেট কল্যুয়ার রুট)। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিব্বতের দিক থেকে যত অভিযান সংগঠিত হয়েছে, ইস্ট-রংবুক হাইওয়ে ধরেই হয়েছে। নর্থ কলে পৌঁছে ম্যালরির মনে হ'ল, এভারেস্ট তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছে। সেই থেকে শয়নে স্বপনে জাগরণে ম্যালরির মাথায় শুধু এভারেস্ট, এবং এভারেস্ট সামিট। Because it is there!

২২-এর গল্প আগে বলেছি। এবার ২৪-এর গল্পে আসি। সেটাই মহাকাব্যিক যাত্রার প্রকৃত শুরুয়াত। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪, লিভারপুল বন্দর থেকে ছাড়ল জাহাজ 'এস এস ক্যালিফোর্নিয়া'। যাত্রীদের মধ্যে আছেন জর্জ ম্যালরি, এবং এভারেস্ট দলের আরও তিনজন। বাকি তিনজনের একজন ছিলেন স্যান্ডি আরভিন, যিনি তখনও অক্সফোর্ডের এক আন্ডারগ্রাজুয়েট (ইঞ্জিনিয়ার) ছাত্র। জাহাজে বসেই ম্যালরি ও আরভিনের মধ্যে ভাবসাব জমে ওঠে, একুশ বছরের তরুণকে ম্যালরির এতটাই পছন্দ হয়ে যায় যে তিনি রুথ -কে তড়িঘড়ি একটা চিঠি লিখে বলেন, 'ছেলেটি দারুণ চৌখশ, সব ব্যপারেই বুঝি ভরসা করা যায়।' অথচ ছেলেটির কোনওরকম আরোহণের অভিজ্ঞতা ছিল না। সেবারে অভিযান চলাকালীন এভারেস্টের অন্দরে থেকে পাহাড় চড়ার পায়ে-হাতেখড়ি হয়। প্রশ্ন হ'ল, কেন এই ছেলেটিকে দলে নেওয়া হ'ল? আসলে কিছুদিন আগে সে কলেজ-দলের সঙ্গে উত্তরমেরু অভিযানে গিয়েছিল। তখন সে বিখ্যাত জিওলোজিস্ট মাউন্টেনিয়ার নোয়েল ওডেলের নজরে পড়ে যায়। ঘটনাচক্রে ওডেল ঐ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি আবার আগামী এভারেস্ট দলে গুরুত্বপূর্ণ একজন। ভয়ঙ্কর শীতল মেরুদেশে আরভিনের সহ্যক্ষমতা তাঁকে চমকে দিয়েছে, এবং তিনি মনে করেন যে এই ছেলেটি হিমালয়ে যুঝতে পারবে। সময় এগিয়ে আসতেই ওডেল দলনেতা জেনারেল ব্রুসের কাছে স্যান্ডির নাম সুপারিশ করেন, এবং জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাও করেন। ব্রুস খুব একটা মাথা ঘামালেন না, 'আচ্ছা, একটা এক্সপেরিমেন্ট হোক' বলে ছোকরা ইনিজনিয়ারকে দলে নিয়ে নিলেন। সে দলে ঢুকলো এবং সবার মন জয় করে নিলো।

আরভিনের বড় সম্পদ ছিল দুর্দান্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সে যে কোনও যন্ত্রপাতির খোলনলচে বদলে দিতে পারত। বেস-ক্যাম্পে বসে স্টোভ, ক্যামেরা, অন্যান্য সরঞ্জামের নিয়মিত সার্ভিসিং করার পাশাপাশি নজর দিয়েছিল কী করে অক্সিজেন ব্যবহারের জুতসই ব্যবস্থা করা যায়। ক্যাম্পে অক্সিজেন সিলিন্ডারের মজুত ছিল ঠিকই, কিন্তু সেগুলোর কাজ ছিল আপৎকালীন অবস্থা সামাল দেওয়া। পিঠে সিলিন্ডার বেঁধে ক্লাইম্ব করার রেওয়াজ ছিল না, আক্সিজেন সাপোর্ট নিয়ে ক্লাইম্ব করা নাকি অ্যাডভেঞ্চার স্পিরিটের অসম্মান! তাছাড়া সিলিন্ডারগুলি বেজায় ভারি, তার কোনও বহনযোগ্য সাপ্লাই-সিস্টেম নেই। ম্যালরি কথাচ্ছলে তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখ, ক্লাইম্বিংয়ে এগুলো কাজে লাগানো যায় কিনা।' আরভিন সাত পাঁচ না ভেবেই কাজ শুরু করে দিয়েছিল। সে জানত না, ম্যালরি ঠিক কী পরিকল্পনা করেছেন। যাই হোক, রংবুক গ্লেসিয়ারের মুখে বিশাল বেস-ক্যাম্প লেগেছে। অভিযান চলবে আগের মতো ইস্ট-রংবুক হাইওয়ে, নর্থ-কলের রাস্তা ধরে। নর্থ -কলের রাস্তাটাই তো একমাত্র রাস্তা। সাউথ-কল আবিস্কার হয়েছে অনেক পরে, যদিও সাউথ-কল সবচাইতে পছন্দের, এবং সর্বাধিক অভিযানে অনুসৃত পথ।

আরভিন দলে সবার প্রিয়। কারণ শুধু তার সুন্দর মুখ নয়; সে হাসিখুশি, মিশুকে, এবং অবিশ্বাস্য পরিশ্রমী। কদিন যেতেই সে হালকা সিলিন্ডার বানিয়ে ফেলল, সঙ্গে পোর্টেব্‌ল মাস্ক। সবাই উচ্ছ্বসিত। ম্যালরি খুব যে সাবাসী দিলেন তা নয়, পিঠ চাপড়ে পরামর্শ দিলেন, বানানো ব্যবস্থাগুলো যাতে ঠিকঠাক থাকে তার নজর রাখতে। রেকর্ড বলছে, এপ্রিলের শেষদিকে বেসক্যাম্প মিটিংয়ে ম্যালরি প্রথম অক্সিজেন সাপোর্ট ক্লাইম্বের প্রস্তাব রাখেন। তাঁর যুক্তি ছিল, অক্সিজেন ছাড়া হাই অলটিচ্যুডে যথেষ্ট লড়াই দেওয়া যাবে না। অনেক যদি কিন্তুর পর প্রস্তাবটি পাশ হ'ল বটে, কিন্তু অধিকাংশের মতো সিলিন্ডার নিয়ে ক্লাইম্ব করা অনেক ঝঞ্ঝাটের, এবং সেটা হাস্যকর, তাই ওটাকে ম্যালরির অপশান বলে একপাশে সরিয়ে রাখা হ'ল। প্রস্তাব পাশ হ'ল, পরে ভেবে দেখা হবে। যাই হোক, বেসক্যাম্পে দল আটকে গেল বেশ কিছু সপ্তাহের জন্য। কারণ

খারাপ আবহাওয়া। পরের রেকর্ড বলছে, ২৭ মে আর একটি গুরুত্বপূর্ন সভা হয়, সভাপতি নর্টন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, খুব শিঘগির আরোহীরা বেরিয়ে পড়বে, ছ'নম্বর ক্যাম্প পর্যন্ত উঠে পর পর দুবার শিখরের লক্ষ্যে অভিযান করবে, অক্সিজেন ছাড়াই। বোঝা গেল, ম্যালরির পরিকল্পনা বাতিল হয়েছে।

রেকর্ড আরও বলছে, মে মাসের শেষে এবং জুনের ঠিক শুরুতে প্রথম সামিট অভিযানে জুটি বাঁধেন ম্যালরি এবং দলনেতা ব্রুস। বেসক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ওয়ান, টু, থ্রি করে পাঁচ নম্বর ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছে যান খুব ঝক্কিঝামেলা ছাড়াই। এর পরেই সামিট ক্যাম্প। মনে রাখতে হবে তখন সামিটক্যাম্প মানে ছ-নম্বর ক্যাম্প। ব্রুস ম্যালরি জুটি ক্যাম্প-ফাইভ থেকে সিক্সে যাবেন, সেইমতো প্রস্তুতিও সারা। কিন্তু কী অজ্ঞাত কারণে ম্যালরি নিজেকে সরিয়ে নিলেন প্রথম সামিট অ্যাটেম্প্ট থেকে, এবং নেমে এলেন ক্যাম্প ফোরে – এর নেপথ্যে ঠিক কী হয়েছিল আজও জানা যায়নি। ক্যাম্প ফোরে তাঁকে দেখা গেল খুব তিতিবিরক্ত মেজাজ, কারও সঙ্গে কথা বলছেন না, সারাক্ষণ শুধু ভেবে যাচ্ছেন। ওদিকে নর্টন সোমারভিল দ্বিতীয় জুটি বেঁধে পৌঁছে গেছেন ক্যাম্প ছয়ে, এবং ২ জুনের এক সুন্দর সকালে ওরা সেকেন্ড অ্যান্ড অফিসিয়ালি ফাইনাল সামিট পুশে বেরিয়ে পড়লেন। আবহাওয়া খুব ভালো ছিল, নর্টন বিনা অক্সিজেনে ২৮,১২০ ফুট উচ্চতায় নজির তৈরি করে ফিরে এলেন। কারণ খুব স্পষ্ট না হলেও যুক্তিগ্রাহ্য অনুমান হ'ল, ওঁদের হাতে সময় বিশেষ ছিল না, দুজনের কেউই ঠিক সুস্থও ছিলেন না। সবাই ধরে নিলো, অভিযান এবারের মতো শেষ। ব্রুস বা নর্টন কেউই তখনও ভাবেননি, কী চমক অপেক্ষা করছে।

ওদিকে ম্যালরি নেমে গেছেন তিননম্বর ক্যাম্পে। সেখানে স্যান্ডি আরভিন সিলিন্ডার-সহ নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে টাইম-পাস করছেন। ম্যালরি তাঁকে অগ্রজের মতো নির্দেশে দিলেন পর্যাপ্ত সিলিন্ডার, সাপ্লাই-সিস্টেম নিয়ে তৈরি হতে। সে ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করে, 'আমি যাবো কোথায়?' উত্তর আসে 'এভারেস্টের চূড়োয়!' (পর্ব ২-এ শেষ)

Climb the Mountain … so that you can see the World, not that the World can see you …. !